মিল এবং অমিল

তসলিমা নাসরিন

অনেকে সালমান রুশদির সঙ্গে আমার নামটা প্রায়ই উচ্চারণ করে, দেশে বিদেশে সবখানে। কিন্তু একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজনের যদি বিরাট পার্থক্য থাকে, তবে এই উচ্চারণ খুব স্বাভাবিক, যে, অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমাকে যখন সরাসরিই বলা হয় আমি *মহিলা রুশদি,* আজকাল প্রশ্ন করি, *সালমান রুশদিকে বরং পুরুষ নাসরিন বলছো না কেন শুনি?* এক ফতোয়া ছাড়া, আমি বেশ ভালো জানি, যে, আমাদের মধ্যে যা আছে, সব অমিল। রুশদি পুরুষ। আমি মেয়ে। এটা অনেক বড় অমিল। পুরুষ হওয়ার কারণে তিনি সুবিধে ভোগ করেন আর মেয়ে হওয়ার কারণে আমি অসুবিধে ভোগ করি। অমিলগুলো এক এক করে বলছি-- ফতোয়া জারি হওয়ার পর রুশদি মৌলবাদীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন, তওবা করে খাঁটি মুসলমান হওয়ার পণ করেছিলেন। আমি ক্ষমা চাইনি। আমি মুসলমান হতেও চাইনি। শৈশব থেকেই আমি নাস্তিক, মাথা উঁচু করে সেই নাস্তিকই রয়ে গেছি, যত ঝড়ঝাপটাই আসুক না কেন। যে দেশ থেকে রুশদির বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হয়েছিলো, সেই ইরান নামের দেশে রুশদি কোনওদিন বাস করেননি। যে দেশে আমার ফাঁসি চেয়ে জঙ্গিদের মিছিল হয়েছে বছরের পর বছর, যে দেশে আমাকে হত্যা করার জন্য অসহিষ্ণু মুসলমানরা উন্মাদ হয়ে উঠেছিলো, যে দেশে সরকারের রুজু করা মামলার কারণে আমার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হয়েছিলো, আর তার ফলে আমাকে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে মাসের পর মাস, যে দেশে আমাকে হাতের কাছে পেলে মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা ছিঁড়ে ফেলতো, সেই দেশেই আমি যাবতীয় তাণ্ডবের সময় সশরীরে উপস্থিত ছিলাম। মৌলবাদী এবং সরকারের সকল অত্যাচার আমাকে সইতে হয়েছে একা। ফতোয়ার কারণে রুশদিকে কেউ তাঁর দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়নি। তাঁর নির্বাসনদণ্ড হয়নি। ইংলেণ্ড রুশদির দেশ, ওখানে তিনি ছিলেন, ওখানেই তিনি থাকছেন। রুশদির ওপর জারি হয়েছে সাকুল্যে একটি ফতোয়া, আমার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ থেকে তিনটে ফতোয়া, ভারত থেকে পাঁচটে। সবগুলোতেই মাথার দাম ধার্য করা হয়েছে। রুশদিকে কোনও দেশ থেকে নয়, আমাকে দু দুটো দেশ থেকে আমার লেখার কারণে তাড়ানো হয়েছে। রুশদির একটা বই নিষিদ্ধ হয়েছে, আমার পাঁচটে বই নিষিদ্ধ,। লজ্জা, আমার মেয়েবেলা, উতল হাওয়া, দ্বিখণ্ডিত, সেই সব অন্ধকার। রুশদি ধর্মের নিন্দা করলেও ধর্মমুক্ত মানববাদী কোনও দলের সঙ্গে বা মানবাধিকার সংস্থার সঙ্গে জড়িত নন, আমি সক্রিয়ভাবে জড়িত। ব্যক্তিজীবনে রুশদি অত্যন্ত উন্নাসিক লোক, আমি সম্পূর্ণ তার বিপরীত। রুশদি একটার পর একটা নিজের হাঁটুর বয়সী মেয়েদের ধরছে,

ভোগ করছে আর ছাড়ছে। তাঁর বুড়ো বয়সের ভীমরতিকে ভীমরতি হিসেবে দেখা হয়না বরং তাঁকে বেশ শক্ত সমর্থ সুঠাম সুন্দর প্রেমিক হিসেবেই সম্মান করা হয় এবং বেশির ভাগ পুরুষের কাছে তিনি ঈর্ষার পাত্রও হয়ে ওঠেন। আর, এদিকে পুরুষসঙ্গীহীন জীবন কাটালেও আমাকে নিয়ে নানারকম যৌনতার কেচ্ছা কাহিনী লিখে বেড়ানো এবং আমাকে *বেশ্যা* বা *বিকৃত মেয়েমানুষ* বলার লোকের অভাব নেই। যৌন জীবন উপভোগ করবে পুরুষ। মেয়েরা তা উপভোগ করলে বা উপভোগ করার অধিকারের কথা বললে বা লিখলে সে 'বেশ্যা''। লেখালেখি শুরু করার শুরু থেকে লোকের নিন্দা আর ছিছি শুনে আসছি। মেয়েদের যৌন স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করে আমি নাকি সমাজের বারোটা বাজাচ্ছি। রুশদির সঙ্গে আর একটা চমৎকার মিল বা অমিল আমার আছে। **রুশদিকে যারা ভালো লেখক বলে, তাদের বেশির ভাগ লোকই রুশদির লেখা পড়েনি। আমাকে যারা খারাপ লেখক বলে, তাদের বেশির ভাগ লোকই আমার লেখা পড়েনি।**

রুশদির নামের সঙ্গে আমার নাম জড়ানো হচ্ছে ১৯৯৩ থেকে। ইরানি ফতোয়া জারি হওয়ার পর রুশদি তখন আলোচিত এবং বিখ্যাত একটি নাম। এদিকে আমার মাথার দাম ঘোষিত হওয়ার পর বাংলাদেশ আর ভারতের সীমানার বাইরে লোকে সবে জানলো আমার নাম। আমি যখন অন্তরীণ অবস্থায় ছিলাম বাংলাদেশে, তখন অন্য সব ইওরোপের লেখকদের আমার পক্ষে খোলা চিঠি লেখার আন্দোলনে রুশদিও ছিলেন। এরপর যখন দেশান্তরী করা হলো আমাকে, নির্বাসন জীবনেই শুনেছি জার্মানির এক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সম্পর্কে আমার মন্তব্য পড়ে রুশদি নাকি রীতিমত রেগে আগুন। ওই পত্রিকায় আমি হতাশা প্রকাশ করেছিলাম এই বলে যে ফতোয়ায় ভয় পেয়ে রুশদির ক্ষমা চাওয়া নিশ্চিতই একটি কাপুরুষোচিত আচরণ।

রুশদি এখন নিউ ইয়র্ক শহরে বাস করছেন। নিউইয়র্ক শহরে আমিও বাস করছি। কিন্তু আমাদের দেখা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তিনি আমেরিকার লেখক কবিদের যে বড় সংগঠন আছে, পেন ক্লাব, তার প্রেসিডেন্ট পদে বহাল। দু বছর ধরে পেন ক্লাব থেকে মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশাল অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন লেখককে নিয়ে আসা হয়েছে, প্রায় সবাই অচেনা। সালমান রুশদি জানেন যে আমি ভারত থেকে সবে বিতাড়িত হয়ে এসেছি। আমার মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর যে আঘাত এসেছে তা ঘৃণ্য এবং অবিশ্বাস্য। আমার প্রায় সব বইই বাংলাদেশে হয় সরকারীভাবে, নয় সমাজাকিভাবে নিষিদ্ধ। শুধু বাংলাদেশ থেকে নয়, লেখার কারণে আমাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাড়ানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ সাড়ে সাত মাস আমাকে কলকাতায় আর দিল্লিতে গৃহবন্দি অবস্থায় রাখা হয়েছে তাড়ানোর প্রক্রিয়া চালাতে গিয়ে। শেষ পর্যন্ত আমাকে ভারত থেকে বরে করে দেওয়া হয়েছে। জ্বলজ্বল করা আমার ইতিহাসকে ছলে বলে কৌশলে অস্বীকার করে সালমান রুশদি বাক স্বাধীনতার উৎসব করছেন।

তিনি যা ইচ্ছে করতে পারেন। নিজের নিরাপত্তা রক্ষীদের একজন তাঁর বিরুদ্ধে বই লিখেছেন, সেই বই ছাপা না হওয়ার জন্য তিনি প্রকাশকের সঙ্গে ব্যবস্থা করে রেখেছেন। হ্যাঁ তিনিই বাক স্বাধীনতার উৎসব করছেন। তিনি পুরুষ, ষাট পার হলেও কচি মেয়েদের দিকে লোভ করলে লোকে মন্দ বলে না। মেয়েরা যদিও অভিযোগ করেছে যে রুশদি তাদের যৌন বস্তু ছাড়া অন্য কিছু মনে করেন না, তাতেও লোকে ঘৃণা ছোড়ে না তাঁর দিকে। এই প্রচণ্ড পুরুষবাদী লেখক প্রচুর নাম, প্রচুর যশ, প্রচুর খ্যাতি পাওয়া লোক, তার সঙ্গে ফতোয়ার মিল ছাড়া আর কোনও মিল নেই বলে আমি স্বস্তি বোধ করি, এবং তাঁর নামের সঙ্গে আমার নাম কেউ যোগ করলে সত্যি বলতে কী, বিরক্তিবোধ করি আমি।

আরও একটা নামের পাশে আমার নাম গত দু বছর ধরে বেশ জড়ানো হচ্ছে। তিনি মকবুল ফিদা হোসেন। তিনি বিশাল শিল্পী। তাঁর ছবি ভারতে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হয়। তাঁকে ভারতের এক নম্বর শিল্পী বলে মনে করেন অনেকে। তিনি সম্প্রতি হিন্দুর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছেন স্বরস্বতীর উলঙ্গ ছবি এঁকে। হিন্দুরা তাঁর ছবি নষ্ট করে দিয়েছে, তাঁকে হুমকি দিয়েছে, তিনি দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। আমি মানুষের একশ ভাগ বাক স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। মকবুল ফিদা হোসেনের যা ইচ্ছে করে তাই তার আঁকার স্বাধীনতা আছে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁকে এ কারণে অত্যাচার করার কোনও অধিকার কারও থাকতে পারে না। ফিদা হোসেনের মতো বিশাল একজন শিল্পীর নামের সঙ্গেও আমার মতো ক্ষুদ্র নামটি যুক্ত হলে আমি অস্বস্তি বোধ করি। কারণ ক্ষুদ্র হলেও আমি আমার আদর্শকে অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করি, আমার আদর্শের সঙ্গে মোটেও মেলে না এমন কোনও মানুষ, সে মানুষ পৃথিবীতে যে কোনও কারণেই হোক বিখ্যাত হলে তাঁর প্রতি আমার কোনও পক্ষপাত জন্ম নেয় না। তাঁর নামের পাশে আমার নাম উচ্চারিত হলে আমি সামান্যও পুলকিত হই না। মকবুল ফিদা হোসেনের উলঙ্গ স্বরস্বতী আঁকা নিয়ে ভারতে যখন বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে, আমি খুব স্বাভাবিক কারণে শিল্পীর স্বাধীনতার পক্ষে। মুসলমানদের মধ্যে যেহেতু নাস্তিকের সংখ্যা বিরল, ওরা ধর্মমুক্ত বা নাস্তিক হলে বিষম আরাম বোধ করি। মকবুল ফিদা হোসেনের ছবি এরপর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখি হিন্দু ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম নিয়ে, বিশেষ করে তাঁর নিজের ধর্ম ইসলাম নিয়ে তিনি কোনও ব্যঙ্গ করেছেন কীনা! দেখলাম কিছুই করেননি। বরং আরবিতে আল্লাহু শব্দটি লিখে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহ ব্যবহার করেছেন ক্যানভাসে। আমি স্পস্ট দেখতে পাই ইসলামে তার অগাধ শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস। ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মে তিনি বিশ্বাস করেন না! হিন্দুত্বের প্রতি অবিশ্বাস থেকেই লক্ষ্মী এবং স্বরস্বতীকে উলঙ্গ এঁকেছেন! তিনি কি মুহম্মদকে উলঙ্গ আঁকবেন? আমি নিশ্চিত, তিনি আঁকবেন না। আমার কোনও অসুবিধে নেই সব ধর্মের দেবদেবী বা পয়গম্বরদের উলঙ্গ আঁকতে। পৃথিবীর সব ধর্মের প্রতি আমার সমান অবিশ্বাস। কোনও ধর্মকে একটির ওপরে স্থান

দেবো, একটিকে ঘৃণা করবো, আরেকটিকে ভালোবাসবো, বা বিশ্বাস করবো, এই সমস্যা আমার নেই। সব ধর্মই বলে *তোমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ এবং সত্য এবং নির্ভুল, তোমার ঈশ্বরই সত্যিকার ঈশ্বর, বাকি ধর্ম ভুল, বাকি ঈশ্বর মিথ্যে!* এই শিক্ষা নিয়ে গড়ে ওঠা ধর্মান্ধ সন্ত্রাসীরা খুব সহজেই বিধর্মীদের আক্রমণ করে। ক্রিশ্চান সন্ত্রাসীরা একসময় ভীষণ সন্ত্রাস চালিয়েছে, ইওরোপে। এখনও গর্ভপাতের বিরুদ্ধে থেকে থেকে তারা হিংস্রতা দেখাচ্ছে। হিন্দু সন্ত্রাসী সম্প্রতি আক্রমণ করেছে ভারতের অযোধ্যায়, গুজরাতে। মুসলমান সন্ত্রাসীদের আক্রমণে ভারতবর্ষ কেন, সারা বিশ্বই কেঁপে উঠছে বারবার।

ফিদা হোসেন সেই সব ধার্মিকদের মতো, যারা নিজের ধর্মে বিশ্বাস রেখে অন্য লোকের অন্য ধর্মে বিশ্বাসকে নিন্দা করেন। ফিদা হোসেনের সঙ্গে নাম উচ্চারিত হতে, যদিও তিনি মহীরুহ ,আমি তুচ্ছ তৃণ, আমার আগ্রহ হওয়ার কোনও কারণ নেই। কারণ আমি নাস্তিক, এবং তিনি শুধু আস্তিক নন, শুধু তাঁর নিজের ঈশ্বরের বেলায় তিনি আস্তিক। শত শত অন্য ঈশ্বর যে আছে জগতে, সেগুলো বিশ্বাসের প্রশ্ন উঠলে তিনি অবশ্য আস্তিক নন।

ফিদা হোসেনের সঙ্গে আমার মিল শুধু একটিই, প্রায় কাছাকাছি সময়ে একদল ধর্মান্ধ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দেশ ছাড়তে হয়েছে আমাদের। এ ছাড়া আর যা আছে সব অমিল। প্রথম অমিলটি হল, তাঁর নির্বাসনটি স্বেচ্ছা নির্বাসন, আমার নির্বাসনটি স্বেচ্ছার নয়। আমার কলকাতার বাড়ি থেকেই শুধু নয়, আমাকে ভারত থেকেই বের করে দেওয়া হয়েছে। না, কোনও ধর্মান্ধরা বের করেনি, বের করেছে স্বয়ং সরকার। ফিদা হোসেনের বাস করার বাড়ি ঘর আছে বিদেশে, আমার নেই। ফিদা হোসেনকে দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সরকার চেষ্টা করছে, আমাকে না বাংলাদেশের সরকার, না ভারতের সরকার ফিরতে দিচ্ছে। ভারত থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর যতবারই আমি ভারতে বাস করার জন্য ঢুকেছি, পত্রপাঠ আমাকে বিদেয় করে দেওয়া হচ্ছে। ফিদা হোসেন একটি ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন, আমি নারীর অধিকারের কথা বলতে গিয়ে সব ধর্মের নারীঅধিকারবিরোধী শ্লোকের সমালোচনা করে মূলত যে কথাটি বলি তা হল সমানাধিকারের ভিত্তিতে আইন তৈরি হোক, নারী বিরোধী আইন এবং সংস্কৃতির অবসান হোক, ধর্মের সমালোচনা করলে আমি সব ধর্মের সমালোচনা করি, নিজের আত্মীয় স্বজনের ধর্ম ইসলামকে বাদ দিয়ে করি না।

রুশদি এবং ফিদা হোসেনের মতো নাম যশ খ্যাতি প্রতিপত্তি আমার নেই। কিন্তু তারপরও আমি তাঁদের নামের সঙ্গে আমার নাম কোনও কারণে উচ্চারিত হোক চাই না। দীর্ঘ বছর যাবৎ আমি যেভাবে নির্যাতিত হচ্ছি ধর্মান্ধ এবং ক্ষমতাসীন সরকার দ্বারা, এর নির্যাতনের সামান্যও তাঁরা কেউ ভোগ করেননি। যেভাবে গৃহহীন অবস্থায় অনিশ্চয়তার অন্ধকারে দিনের পর দিন আমাকে বিদেশ বিভুঁইয়ে কাটাতে হচ্ছে, অসুখে অভাবে একা আমাকে নিজের বাঁচার সংগ্রাম, একই সঙ্গে

নিজের আদর্শ এবং বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম করে যেতে হচ্ছে, তা ফেলনা জিনিস নয়। রুশদি বা হোসেনকে এমন দুঃসহ অবস্থার ধারে কাছেও কাটাতে হয়নি। তাঁদের শিল্পের প্রতি আমি অপরিসীম শ্রদ্ধা রেখেই বলছি যে ওই দুজন পুরুষের সঙ্গে আমাকে এক ব্রাকেটে ফেলা অনুচিত। ধর্মমুক্ত ও বৈষম্যমুক্ত, সাম্য ও সমানাধিকার সম্বলিত একটি সমাজের জন্য আমার নিরন্তর সংগ্রাম মানুষ যে চোখেই দেখুক, আমার আদর্শের ধারেকাছে আসার কোনও যোগ্যতা তাঁদের নেই, তাঁরা যত বড় শিল্পীই হোক না কেন।